প্র কা শ ক থা

অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ এই বইটিতে লেখক সুস্নাত চৌধুরী ন্যায্যতই খানিক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—যে ভাষায় সাতাশ কোটি মানুষ কথা বলেন, সে ভাষায় প্রকাশনার এমত দৈন্য নিয়ে। অবশ্য আরেকটু খতিয়ে দেখলে এ দৈন্য তো অন্যতর পুরোনো পেশা ও শিল্পের ক্ষেত্রেও সত্যি, এবং তা বিচ্ছিন্ন একটি উপসর্গ নয়! সমাজেতিহাস ও অর্থনীতি এর কারণ নির্ধারণ করছে, 'মানসিকতা' বিষয়টিকেও তা-ই গড়ে পিটে নেয়। মানসিকতা, অভ্যাস, রীতি কোনোটাই স্বয়ম্ভু নয়। অবিভক্ত বাংলার সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি বয়নশিল্পের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পরে তাকে ত্যাজ্য করে দেওয়ার মধ্যেই আমাদের আর্থনীতিক অবনমনের মূল সূত্রটি লুকিয়ে আছে। উপরন্তু ১৯১১-য় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানী কলকাতা ছেড়ে দিল্লি পাড়ি দিলে দিশেহারা শিক্ষিত বাঙালি খানিক না-ঘর-কা-না-ঘাট-কা হয়ে পড়ে—কারণ শহুরে 'বাঙালি ভদ্রলোক'-দের (যাঁদের মধ্য থেকেই কালক্রমে প্রকাশকরা উঠে আসবেন) তৈরিই করা হয়েছিল করণিক হিসাবে, বাঙালির স্বাধীন উদ্যোগী অতীতকে কবর চাপা দিয়ে। সে সময়কাল থেকেই বাঙালি পেশাদারি পরিসরে 'বড়ো কিছুর স্বপ্ন' দেখতে কুঁকড়ে থেকেছে। প্রকাশনাও এর বাইরে ছিল না। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, থাকবেও। লেখক এই যে প্রকাশকদের অপেশাদিরত্বকে চিহ্নিত করেছেন—তা মোটামুটি সার্বিক, এবং এক কটু সত্যি।

মুখবন্ধ

একজন পদার্থবিদকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে থেকেই পদার্থবিদ্যার পাঠ নিতে হয়—একজন পেশাদার ফুটবলারকে ক্লাব হোক বা আকাদেমি, নিয়মিত প্রশিক্ষণের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে—সংগীতশিল্পীকে নাড়া বাঁধতে হবে গুরুর কাছে—কেউ যদি চান কবি হতে, তাঁর প্রথম কাজই হল অতীত ও বর্তমানের কাব্যকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা, দেশ-বিদেশের প্রচুর কবিতা পড়া—কৃষকের জন্য যেমন অত্যাবশ্যক পারিবারিক বা আঞ্চলিক উত্তরাধিকারসূত্রে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ—আধুনিক সমাজে এসবের ব্যত্যয় সচরাচর হয় না। আজকের বাঙালির কাছে অবশ্য এর ব্যতিক্রম একটা আছে—প্রকাশনা। একমাত্র প্রকাশক হয়ে ওঠার জন্য এখন প্রথাগত কিংবা প্রথারহিত কোনোপ্রকার পৃথক শিক্ষাদীক্ষা বা প্রস্তুতিরই আর প্রয়োজন পড়ে না—স্রেফ বই নামক পণ্যটির প্রতি কিছুটা 'ভালোবাসা' এবং হালে একটি ফেসবুক পেজ থাকলেই চলে। লেখক কিংবা পাঠকের অবস্থান থেকেও আজকাল 'অনায়াসে' ও 'চটজলদি' প্রকাশক হয়ে ওঠা যায়, সম্পাদক তো হয়ে ওঠা যায়ই! যিনি লেখালিখি করেন কিংবা যিনি প্রচুর বই পড়েছেন, এসব কাজগুলিই-বা তাঁর কাছে খামোখা খটমট ঠেকবে কেন!

এই প্রবণতা ভালো না খারাপ, তা বলার অধিকারী আমি নই। কিন্তু আজকের প্রকাশনা-প্রয়াসীদের আবেগ বা আন্তরিকতার সততা নিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিমত পোষণ না করেও এ-কথা বলা যায়, আন্তর্জাতিক মহল তো দূরস্থান,

ক

১৭ হ্যালেড বিভ্রান্তি
২১ ছাপার ভূত
২৪ গ্রন্থনির্মাণ কি আদৌ ‘শিল্প’
২৮ হরফ সভ্যতা
৩৩ দপ্তরিদের পাড়া
৩৬ বই বনাম বৈ-বই
৩৯ বাংলা বইয়ের দাম
৪৩ দুষ্প্রাপ্য বই
৪৭ কড়ি দিয়ে ছাপলাম
৫১ প্রচ্ছদের কার্য-কারণ
৫৫ মলাটের ললাটলিখন
৬০ দোকানের পুস্তকসজ্জা

খ

৬৭ গাইডবুক থেকে ইতিহাস বই
৭০ বই তৈরির বই
৭৪ পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
৭৯ তথ্যঘাতী বাঙালি
৮৩ স্বত্বকথন
৮৮ উৎসর্গের উপসর্গ
৯৩ নিজ নিকেতনে লেটারপ্রেস
৯৭ অভিনব অভিধান
১০১ হরফপত্র
১০৬ পাঠের ভবিষ্যৎ
১০৯ ছোটো ছোটো দুটি বই

গ

১১৫ বিধবা ও অনাথের গল্প
১১৯ বাঁকা হরফ মানেই কি *ইটালিক*
১২৬ ড্যাশ দিগন্ত
১৩১ নাই-বা বুঝুক বেবাক লোক
১৩৫ অলস কুকুর কিংবা আষাঢ়ের এক সকালে
১৪০ যত হাসি তত কান্না
১৪৪ আইএসবিএন নিয়ে
১৪৯ প্রসঙ্গ পেপারব্যাক
১৫৪ নরম পাকের কড়া কথা
১৫৮ শূন্য শুধু শূন্য নয়
১৬২ আরও শূন্যস্থান
১৬৬ বইয়ের তাক
১৭৩ হরফ-গোয়েন্দা
১৭৬ হঠাৎ লেনা-র জন্য
১৮০ পুস্তানি না পেরিয়ে

হ্যালেড বিভ্রান্তি

১৭৭৮ সালে ছাপা বই নিয়ে পাক্কা দুশো চুয়াল্লিশ বছর পরে মহা ফাঁপরে পড়া গেল! মুভেবল মেটাল টাইপ বা বাংলা বিচল ধাতব হরফ ব্যবহার করে মুদ্রিত সেই প্রথম বইয়ের নামপত্র ঘিরেই জন্ম নিল বিচিত্র এক ধন্দ!

A Grammar of the Bengal Language। হ্যালেড সাহেবের লেখা এই ব্যাকরণ বই ছাপা হয় হুগলি জেলায়। ১৭৭২ নাগাদ ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালেড ভারতে আসেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মী হিসেবে। তিনি বাংলা ভাষা শেখেন, ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণও রচনা করেন। এই বই ছাপার কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকারের নাম। সেকালের রেওয়াজ মেনে বইটির টাইটেল পেজ বা নামপত্রের শেষে গ্রন্থ মুদ্রণের সাল লেখা হয় রোমান সংখ্যাক্রমে। M DCC LXXVIII, অর্থাৎ ১৭৭৮। আর, এইখানেই বিপত্তি!

হালে বেরোনো দুটি মহার্ঘ বইয়ে এই নামপত্রের ছবি জায়গা পেয়েছে। একটি তো হ্যালেডের ব্যাকরণের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণই (সম্পাদনা ও ভূমিকা: পবিত্র সরকার, এপ্রিল ২০২২, পত্রভারতী); অপরটি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত শিল্পী সব্যসাচী হাজরার বাংলা হরফ-বিষয়ক সুমুদ্রিত গ্রন্থ অ: *In the Quest of Bangla Typography* (জুন ২০২২, কথাপ্রকাশ ও নোকতা)। দুটিতেই

গ্রন্থনির্মাণ কি আদৌ ‘শিল্প’

বই যে একটি শিল্পবস্তু এবং গ্রন্থনির্মাণ হল শিল্প—ইদানীং কাউকে কাউকে সে-কথা বেশ পৃথক গুরুত্ব-সহ জোর দিয়ে বলতে দেখি। যাঁরা বলেন, সন্দেহ নেই তাঁরা সংখ্যালঘু। তবু বুঝতে পারা যায়, বাংলা বইয়ের ক্রেতা-পাঠক-সংগ্রাহকদের একাংশের কাছে এই প্রস্তাবনার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু বই বস্তুটি আবিষ্কারের পর অর্ধ সহস্রাব্দ অতিক্রম করে, এমনকি বাংলা ভাষাতেও বই ব্যাপারটি প্রায় আড়াই শতক ছুঁতে চলার পর এ-কথা আলাদা করে উচ্চারণ করতে হচ্ছে মানে, গড় জনমানসে অন্তত ‘শিল্পবস্তু’ হিসেবে বইয়ের মান্যতা নেই। তা সে যতই শোকেসে থেকে ঘরের শোভাবর্ধন করুক-না-কেন!

শিল্পবই বা আর্টিস্টস বুক নামক বিশেষ প্রকরণটির প্রসঙ্গ আনছি না। সাধারণ বইপত্রের ইতিহাসের দিকেও যদি তাকানো যায়, তাহলেও গ্রন্থনির্মাণ ও মুদ্রণকে *আর্ট* হিসেবে ধরে নিতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেই সমস্যা যে অনেকদিনই হচ্ছে এবং তার মূল কারণটিও যে প্রধানত লুকিয়ে আছে আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির নিরিখে গড়ে-ওঠা গণরুচির চারিত্র্যের গভীরে, তা বোঝা যায়। হঠাৎ দু-চার দিনে যা বদলানোরও নয়। কাজেই সে-বিষয়ে শব্দ খরচে আপাতত বিরত থাকাই শ্রেয়। বরং এই সূত্রে খানিক তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা যায়, বই বিষয়টিকে আমরা যে শিল্পবস্তুর তকমা দিচ্ছি, তা ঠিক কেমন শিল্পবস্তু? কিংবা, বই তৈরিকে যদি শিল্প বলেই ধরি, তাহলে সেটি কী ধরনের শিল্প?

যদি একটি অনুচ্ছেদ শুরু হয় কোনো পৃষ্ঠা কিংবা কলমের শেষ লাইন থেকে এবং বাকিটা চলে যায় পরের পৃষ্ঠা কিংবা কলমে, তখন নিচে পড়ে থাকা অনুচ্ছেদের ওই বিচ্ছিন্ন প্রথম লাইনটিকে বলা হয় *অরফ্যান*। আবার যদি কোনো অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে একটি মাত্র শব্দ থাকে, বিশেষত সেটি যদি ছোটো শব্দ হয়, অর্থাৎ তার অক্ষরসংখ্যা যদি কম হয়, তখন অনুচ্ছেদের পাদদেশে পড়ে থাকা ওই একাকী শব্দটিকেও আরেকপ্রকার *অরফ্যান* হিসেবে গণ্য করাই রীতি। দ্বিতীয় ধরনের এই *অরফ্যান*-কে অবশ্য অনেকে *রান্ট* বা বামন বলেও অভিহিত করেন।

উইডো ও অরফ্যান পৃথকভাবে চিহ্নিত করার কারণ হল, পাঠের প্রক্রিয়ায় তারা দৃশ্যগতভাবে ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকে। মুদ্রিত অক্ষরসমূহের *ব্লক* বা চাঙড়ের শুরুতে অথবা শেষে বিচ্ছিন্ন একটি পঙ্‌ক্তি কিংবা অনুচ্ছেদের নিচে ঝুলে থাকা

উইডো ও *অরফ্যান*-এর নমুনা